অভিজিৎ সেনের কয়েকটি ছোটগল্প
পরিবর্তনশীল সময়ের ভাষ্য

শ্রাবণী পাল

আমার লেখার বেশি অংশই আমাদের গ্রামাঞ্চল অথবা মফস্বল শহরের মানুষকে নিয়ে। আমার চরিত্ররা প্রায় সবাই-ই জমি-আশ্রয়ী মানুষ। আর এই জমি-আশ্রয়ী মানুষকে শাসন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের পরিষেবা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত কিছু মানুষ। জমি শাসন জমির শোষণ জমির বিভিন্ন স্বত্ত্ব, কৃষি-আশ্রয়ী মানুষের যাবতীয় বোধ-বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি, আপস-লড়াই ইতিহাস-কিংবদন্তি, এইসব ব্যাপারে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা আমার অন্তত একশোটি গল্প উপন্যাসে আছে।[১]

এই অভিমত স্বয়ং অভিজিৎ সেনের (জন্ম ১৯৪৫)। দিনাজপুরে তাঁর বসবাস সাতের দশকের গোড়া থেকে। তারপর সমবায় ব্যাঙ্কে এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চাকরি সূত্রে এই অঞ্চলে বসবাস। সংলগ্ন ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষগুলোর প্রাত্যহিক দিনযাপনের খবর তিনি রাখেন, গ্রামগুলিকে তিনি চেনেন নিজের কররেখার মতো, পাঠক তাঁর গল্পে পেয়ে যায় উত্তরবঙ্গের ভূমিজীবী মানুষের বিশেষত ব্রাত্যজীবনের নিত্যপীড়িত ক্লিষ্ট দিনযাপনের এক আন্তরিক ও বিশ্বস্ত ছবি।

অভিজিৎ সেন তাঁর লেখালিখি শুরু করেছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন চারপাশ খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। ভূমিসংস্কার অপারেশন বর্গা বেনামি জমি উদ্ধার ও বন্টন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সেদিন গ্রামীণ অর্থনীতিকে যেমন বদলে দিয়েছিল, তেমনই এরই সূত্রে ক্রমশ বদলে যাচ্ছিল ভূমিজীবী মানুষের দিনযাপনের চিত্র, তাদের সামাজিক পারিবারিক কাঠামো। অপারেশন বর্গার সুবাদে দেখা গেল জমি শুধু বাপের নয়, দাপেরও নয়; আবেগেরও বটে। ১৯৭৮-এ পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামজীবনের পরিস্থিতিকে আরও একবার আলোড়িত করল। কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন, কাজের সময়সীমা আট ঘন্টা নির্দিষ্ট হওয়া, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের পথঘাটের উন্নয়ন, প্রশাসনিক আধিকারিকদের গ্রাম থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্ত করা— এইরকম আরও নানা কাজ হয় সাত-আটের

দশকেই। আবার নয়ের দশক থেকে বিশ্বায়নের আগ্রাসনে জাতীয় রাজনীতিতে পালাবদল ঘটে, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতী কাঠামোয় ঢুকে পড়ে দুর্নীতি। ধনী জোতদারও সংগঠনে প্রবেশ করায় শ্রেণীধারণার প্রচলিত সংজ্ঞাও বদলে যায়। গ্রামে বর্ণহিন্দু সমাজে যেমন বদল এসেছিল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে থাকা মার-খাওয়া নিম্নবর্গের মানুষজন তাদের স্বাধিকার অর্জনে সরব হয়। নিম্নবর্গের উত্থান এই সময়ের, এই সময়ের সাহিত্যের একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক। আর এরই পাশাপাশি বদলে গিয়েছিল নারীর সামাজিক অবস্থান। অর্থাৎ কৃষিপ্রধান যে ভারতবর্ষ মূলত গ্রামেই বাস করে এই সময়ে তার চেহারাটা বদলে গেল, বাইরের দিকে যেমন তেমন অন্তঃপ্রকৃতিতেও। সময়ের চাপে ও তাপে পরিবর্তনশীল এই গ্রামবাংলাই তার সমস্ত বাস্তবতা নিয়ে উঠে এল এইকালের ছোটোগল্পে। বস্তুত, প্রাক-সত্তরে নকশাল আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার স্বপ্ন হয়তো সফল হয়নি, কিন্তু কোনও আন্দোলন ছাড়াই বাংলা ছোটগল্পের সীমানা এসময় প্রসারিত হয়ে যেতে থাকে গ্রামীণ মৃত্তিকায়। আর নকশাল আন্দোলনের একজন সক্রিয় অংশীদার হিসেবে অভিজিৎ সেনের অভিজ্ঞতার জারক রসে তৈরি হতে থাকে তাঁর 'গল্প' অথবা সমকালের ইতিহাস।

আটের দশক পড়বার আগে থেকেই বামফ্রন্ট সরকার অপারেশন বর্গা কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণ করতে থাকে। কর্মসূত্রেই হোক্ আর নিজের ভিতর গরজ থাকার কারণেই হোক্, ভূমিসংস্কারের যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবেই পরিচিত হন অভিজিৎ সেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যগত একটা মহত্ত্ব হয়তো ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ শুধু কঠিন নয়, ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। আধিয়ারি স্বত্ব খাতায়-কলমে নথিবদ্ধ হয়, পরিণামে প্রায়শ ধানের বদলে ন্যালপা ঘাস কিংবা বিন্নার খড় —

> আধিয়ারি স্বত্ত্ব নথিবদ্ধ হয়। ... মাঠ-খসড়ার পড়চা পাওয়া যাবে ক'দিন বাদে, তারপরে অ্যাটেসটেশন, তারপরে ফাইনাল, তার মধ্যে ধরা-পড়া, সরকারি লোক। তারপর ব্লক-মহকুমা-সদর, কোর্ট-কাছারি। তারপর হাইকোর্ট, তারপর ইনজাংশন। তার মধ্যে খেপে খেপে দখল-বেদখল, রোওয়া ধানে হাল মই — ফের ধান রোওয়া— এবং একশো চুয়াল্লিশ ধারা— হয়তো শেষে ধানের বদলে ন্যালপা ঘাস কিংবা বিন্নার খড়।[২]

পুরুষানুক্রমে জোতদারের জমি চাষ করেছে ভাগচাষিরা, অর্ধেক মালিককে দিয়েছে অর্ধেক তারা নিয়েছে— প্রচল এই ব্যবস্থা নিয়ে 'হৈ-হ্যাংগাম' হয়নি। জোতদার এর বেশিরভাগ সুবিধা ভোগ করেছে, আর আধিয়ার অল্পকিছু সুবিধা পেয়েই বিগলিত হয়েছে, কৃতজ্ঞ থেকেছে। কিন্তু সব দিন সমান যায় না। তাই

> পরশুরাম মাথা সোজা করে এবং বলে, লিখ্যা ল্যান সাহেব, হামার নাম পরশুরাম মাল, বাপের নাম আস্তিক মাল, ঠাকুরবাবার নাম দিগম্বর মাল, তেনার বাবার নাম ডাম্ফা মাল, উনি আমার কাকা লাগেন, উনার নাম বিম্ব মাল, হামরা চার পুরুষ ইনার জমি আধি চষি। আধা উনাক্ দিই, আধা হামরা খাই। ই সন হামারদের নাম রেকড করবা আজ্ঞা হয়, ... মৌজা দক্ষিণ কাশিয়ানি, দাগ খোতান জানা নাই।[৩]

আস্তিক এসে ছেলেকে ধমক দেয়, মারে, বলে চার পুরুষ ধরে 'হামরা বাবুর চাকর লাগি।' পরশুরাম বিম্বও শেষপর্যন্ত শচীকান্তর পা ধরে ক্ষমা চায়। ব্যাপারটা এখানেই মেটে না। খানাপুরির এই 'দুঃখজনক' ঘটনার জন্য জমিজমা রাখা খুব বেশি নিরাপদ মনে না করে শচীকান্তর দক্ষিণ কাশিয়ানি মৌজার ১০৭৮ ও ১০৭৯ দাগ রাখাল সরকারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এই 'পত্রাঘাত' আস্তিক মাল নামক দৈত্যটিকে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। বাপের মৃত্যু উত্তেজিত করে তোলে পরশুরামকে, রাখাল সরকারকে জমি না দেবার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে সে। প্রাথমিকভাবে সার্কেল ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট পরশুরামদের অনুকূলে যায়। কিন্তু

> সময়টা ১৯৮০ সাল, বড়োই জটিল। রাখাল এত সহজে হাল ছাড়ে না। জে. এল. আর. ও. এফ. আই. আর না করুক সে নিজে ব্যবস্থা করতে পারে এবং করেও।[৪]

প্রথমে অর্থের লোভ দেখায় রাখাল, তারপর পরশুরামের খুড়তুতো বোন সারীকে থানার বড়বাবুর কথামতো তার কাছে ভেট পাঠানোর জন্য রাখাল তার 'পাছুয়া' সুশীলাকে কাজে লাগায়, পুলিশ ধরতে আসে সারীর স্বামী বৈশাখকে গরুচুরির মিথ্যা অভিযোগে, ক্রমাগত ব্যর্থ হয়ে 'রাখালের আপ্রাণ চেষ্টায় শচী উকিলের বাকি পাঁচ একর জমি গোকুল মাস্টার নামে এক ব্যক্তি কেনে,' এই গোকুল কে? লেখক জানান — এই

> গোকুল মাস্টার মাত্র একাত্তর সালে পূর্ববাংলা থেকে এখানে এসে এর মধ্যেই যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে এবং একটি প্রাইমারি স্কুলের চাকরি ও প্রায় বিশ একর জমি এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কি করে সে সংগ্রহ করল, তা ভাবলে তাজ্জব হতে হয়।[৫]

পরশুরামের ওপর চাপের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। গোকুল মাস্টার আর রাখালের দলবল আগ্নেয়াস্ত্র আর ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়ে পরশুরামের রোওয়া ধানটাকে নষ্ট করে দেবার জন্য জমায়েত হয়। তাদের নিরস্ত করল সাঁওতাল পাড়া আর দৈত্যকুলের লোকেরা। কিন্তু কয়েকদিনের বিরতিতে বৈশাখ, বিম্ব, পরশুরাম ও ভণ্ডার উপর বারবার ১০৭ ধারা জারি হয়। যেহেতু যে-কোন মানুষকে হেনস্তা করতে ১০৭ ধারা একটি মোক্ষম অস্ত্র, ফলে বারবার থানা ও মহকুমা সদরে ছুটতে ছুটতে এদের শ্রম ও অর্থের অপব্যয় শুধু হয় না, চাষের কাজে তারা আর সময় কিংবা শ্রম দিতে পারে

না। এইভাবে এক অদ্ভুত 'কৌশলে' কৃষিজীবী দরিদ্র মানুষগুলো এক অভাবিত অবস্থার মুখোমুখি হয় স্তম্ভিত হয়। পরশুরাম অবশ্য হাল ছাড়ে না, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও সে এস. ডি. ও.-কে সরাসরি বলে —

> সাহেব, তুমাক্ হামি কহি দিলাম, ই সন পৌষ-মাঘ মাসতক তুমরা বুঝা পারবেন আইন-ছিংখলা কাক্ কহে। হামার সাতপুরুষে কেহ দাঙ্গা করে নাই, হামিও দাঙ্গা করি না। সাহেব, হামাক্ দেখাও, গেরামে পার্টি করে এমুন কটা ন্যাতার জমি আধি রেকড হয়্যাছে, আঙুল গুন্যে দেখামো? হামার কথা লিখ্যা রাখেন সাহেব, দাঙ্গা করবি ইনারা— পরশুরাম মাল দাঙ্গায় যাবে না, কিন্তুক ধান নিজের খোলাত্ তুলবে। গোকুল মাস্টার, রাখাল সরকার কাগজ দিশাবে, তবি সিকি ভাগ পামেন। আধা নয় সিকি। আর হামি বেবাক আধিয়ারক্ ইকথা শিখামো। জোতদার ঝদি কুনো হাংগাম উঠায় এক ছটাক ধান দিমো না।[৬]

সমস্ত আধিয়ার পরশুরামকে সমর্থন করে। 'চার পুরুষ ধরে চাকর' ছিল যারা, অধিকার দাবি করতে গিয়ে একদিন যে বাপের কাছে মার খেয়েছিল, সে-ই বঞ্চনায়, অত্যাচারে অপমানিত হতে হতে এবার সরবে স্বাধিকার বুঝে নিতে চায়, সঙ্গী পায় আরও অনেককে। 'বর্গক্ষেত্র' অভিজিৎ সেনের মতে, উপন্যাস, আর তাঁর লেখা যে নিভৃতে আলস্যে কেবল ইচ্ছাপূরণের বৃত্তান্ত নয় তা' এখানে চিহ্নিত করে দেন তিনি।

এই ভূমিসংস্কারকে কেন্দ্র করে সেসময়ে পশ্চিমবঙ্গে এক ভিন্ন আবর্ত তৈরি হয়েছিল। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক, কিন্তু কালক্রমে দেখা যায় জোতদাররাই লাভবান হল বেশি। প্রশাসনিক তৎপরতা আইনের ফাঁকফোকরগুলিকে যথাসময়ে ব্যবহার করায় জটিলতা তৈরি হয়েছিল আরও বেশি। স্রষ্টার তৃতীয় নয়ন দিয়ে অভিজিৎ সেন এখানে সমস্যাটিকে যথার্থ চিহ্নিত করেছিলেন —

> ভূমিসংস্কার, ভূমি অধিগ্রহণ এবং সেটেলমেন্ট, এই বিভাগগুলিতে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে একদল খুব খুশি। এইসব বিভাগের আইনে যত ধারা, তার বহুগুণ উপধারা। আইনের সংখ্যা যত বাড়ে, ফ্যাকড়া তত বাড়ে। ফ্যাকড়া যত বাড়ে পয়সা আনার অলিগলি ততই বেশি করে গজিয়ে ওঠে।
>
> ..... আইনশৃঙ্খলার সমস্যা না হয়, প্রতিপক্ষ কোনোরকম নালিশ না উঠাতে পারে সেদিকে দল ও প্রশাসন বড়ো কড়া নজর রাখে। আধিয়ার দাবি জানালে জমি আধিয়ারের নামে আধি-রেকর্ড হয়, আধিয়ারকে প্রতিহত করতে পারলে কিংবা অজ্ঞতাবশত আধিয়ার যদি দাবি না জানায়, জমির বর্গা রেকর্ড হয় না। আরো অনেক কারণ বর্গা রেকর্ড হওয়া না-হওয়ার পিছনে কাজ করে। অসৎ সরকারি কর্মচারী, অসৎ রাজনৈতিক কর্মী, অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি রেকর্ড করানোর কাজে বিভিন্ন রকম প্রভাব বিস্তার করে। স্বজনপোষণ ও পয়সা বর্গা-রেকর্ডের ক্ষেত্রে এবার বিরাট ভূমিকা নিয়েছে।[৭]

'এবার' শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ, লেখকের শ্লেষ এখানে প্রচ্ছন্ন থাকে না। বস্তুত, কোনবার এই স্বজনপোষণ ও পয়সার ভূমিকা বর্গা-রেকর্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি? স্বাধীনতার পরে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে ভূমিসংস্কারের বিস্তারিত কর্মসূচী গৃহীত হয় তার উদ্দেশ্য ছিল সাধু। পরিকল্পনা কমিশন ভূমিসংস্কারকে কেবলমাত্র সিলিং বহির্ভূত জমি ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন ও প্রজার রায়তি অধিকার সুনিশ্চিত করার যান্ত্রিক কর্মসূচী হিসাবে দেখেনি। অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ও ভূমিসম্পদের অসম ও অসঙ্গত ব্যবহারে দীর্ঘ অবহেলার পটভূমিতে পরিকল্পনা কমিশন ভূমিসংস্কারকে প্রগতি এবং সমবন্টনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে, বিষয়টি সংবিধানে যুগ্মতালিকার অন্তর্ভূক্ত থাকায় রাজ্যগুলিকেও ভূমিসংস্কার রূপায়ণে উপযুক্ত পরামর্শ দেয় কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী আইন ও ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কার আইন প্রণীত হয়। দেশে তোড়জোড়ের অভাব ছিল না কিন্তু অভাব ছিল সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং ভূমিসংস্কারের মতো দুঃসাহসিক কাজের জন্য সাহসী মানসিকতা ও পরিকাঠামো। শাসনব্যবস্থায় ভূস্বামীদের অবিসংবাদিত প্রাধান্য থাকায় এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তাদেরই স্বার্থবাহী হওয়ায় ভূমিসংস্কার সম্ভব হল না। একেবারেই হল না তা' নয়, বিভিন্ন সমীক্ষা ও সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সরকারের হাতে বর্তানো মোট কৃষিজমির পরিমাণ ১৩.৯৫ লক্ষ একর (২০০৪, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত), কৃষিজমি বন্টনের পরিমাণ ১০.৯৩ লক্ষ একর (২০০৪, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত), এযাবৎ বর্গাদার নথিভুক্তি ও তাদের চাষে নিশ্চয়তা রয়েছে, ভূমিহীন খেতমজুর, মৎস্যজীবী ও গ্রামীণ কারিগরদের আট শতক পর্যন্ত বাস্তুজমিতে স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু এই ব্যবস্থা দেখিয়ে দিয়েছে জোতদারদের জমি গোপন করার অজস্র পদ্ধতির 'প্রতিভা' দারিদ্র্য আর অশিক্ষা কুসংস্কারের প্রেক্ষিতে ভাগচাষি জমির 'অধিকারী' হয়েও জমির স্বত্ত্ব পায়নি— তীব্র অভিমান এবং অপমান কখনও তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। কখনও জমি চাষ করার কাজটুকুও হারিয়ে আরো দারিদ্র্যে দিন কাটিয়েছে তারা। আবার এমন অনেকে জমির পাট্টা পেয়েছে তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা ব্যবসায়ী অর্থাৎ যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। নথিভুক্ত বর্গাদাররা প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ, উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার এবং সরকারি সেচব্যবস্থা থেকে জলসরবরাহের মতো আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির নাগাল পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু খাস ও বেনামী জমি অধিগ্রহণ ও বর্গা নথিকরণের পর্ব সমাপ্তির পর অভিজাত ভূস্বামীদের একাংশ তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির 'অবশেষ' রক্ষার তাগিদে নিজেদের রাজনৈতিক আনুগত্য বদল করে ফেলায় গ্রামাঞ্চলে রাজনীতির শ্রেণীচরিত্রও বদলে গেল। পালাবদলের সন্ধিক্ষণের এই মুহূর্তগুলো সরকারি নথিতে লিপিবদ্ধ হয়নি, হয়েছে সমকালের সাহিত্যে। জমির অধিকারকে বজায় রাখার চেষ্টায় নিয়মিত সংঘাত ঘটতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে। আর সাত ও আটের দশকের

গল্পের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে এই কৃষি-সম্পর্ক। মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' এবং 'ভাতুয়া', অমর মিত্রের 'দানপত্র', 'ডাইন' স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ঢোঁড়া উপাখ্যান', ভগীরথ মিত্রের 'সে ফেরেনি', মণি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার', অশোককুমার সেনগুপ্তের 'ক্ষেতজননী' ইত্যাদি গল্প তখন লেখা হয়েছে। এই সময়ই যেন অভিজিৎ সেনকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে বিষ, ব্যবচ্ছেদ, আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি গল্প।

'ব্যবচ্ছেদ' গল্পে অভিজিৎ দেখিয়েছেন হাড়ী সম্প্রদায়ভুক্ত বিলাস কীভাবে জমির মালিক থেকে আধিয়ারে পরিণত হয়। 'একচেন্' করে এপারে ছ'বিঘা জমি নিয়ে চলে এসেছিল বিলাস ভুঁইমালী। মধ্যস্থতা করেছিল মহাদেব ঘোষ, নিজের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে। প্রথমদিকে সেটেলমেন্টের কাগজে পরপর তিনদাগে ছ'বিঘা জমি, পাশে লেখা— আধিদং মহাদেব ঘোষ। কিন্তু 'মেয়েমানুষের' পক্ষে, বিশেষ হাড়ী-নিম্নবর্গের স্ত্রীলোকের পক্ষে হাল রাখা যেমন কঠিন, জমি শাসন আরো দুষ্কর। ফলে চতুর মহাদেব গোপনে তার জাল বিস্তার করতে থাকে। এবং

> পরবর্তী বছরগুলোতে জোতদার বিলাস আধিয়ার মহাদেবের বাড়িতে রাত জেগে চিড়া-মুড়ি ভাজে, ধান চাল কোটাভানা করে। আর বিলাসের ছেলে শিয়ালু পনেরোটা গোরুমোষের রাখালি করে।[৮]

কিন্তু ক্রমশ তাদের দু'বিঘা জমির তিন ফসলের স্বপ্ন শিয়ালু আর তার মা বিলাসকে উদ্বেজিত করে। জে. এল. আর. ও হাকিমের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে কথা বলে বিলাস। কিন্তু মহাদেব ঘোষের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা তাদের কতটুকু? একরাত্রে বিলাসের বাড়িতে আগুন লাগে। বিলাস ধর্ষিত হয় আর শিয়ালু গুলি খেয়ে ঘুরে পড়ে আগুনের মধ্যে। অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি করতে পারে ছ'বিঘা জমির এমন একমাত্র দাবিদার নিশ্চিহ্ন হয়। জমির সঙ্গে যৌনতা আর আইনশৃঙ্খলার যোগটিকে ভিতর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই অভিজিৎ জানিয়ে দেন — নির্লিপ্তভাবেই জানিয়ে দেন,

> মহাদেব ঘোষ গ্রেপ্তার হলো। তিনশ' থেকে তিনশ' দশ পর্যন্ত ক্রিমিন্যাল কোডের ধারাগুলোর মধ্যে কঠিন কঠিন সাতটি ধারা দিয়ে তাকে শক্ত বাঁধনে বাঁধল পুলিশ এবং খুবই কৌশলী হাতে সেই বাঁধনের গেরোগুলো ফসকা রেখে দেওয়া হলো। জামিনে বেরিয়ে এসে সে এই ফস্‌কা গেরো খুলবার জন্য খুবই কৃপণের মতো অথচ কার্যত অজস্র অর্থব্যয় করতে লাগল।[৯]

রাজনৈতিক ডামাডোলের কথা বলতে ভোলেননা অভিজিৎ, কেননা শুধু মহাদেবকে না, তিনি তার ভাস্তা দিবাকরকেও চেনেন যে শহরের একটি বিশেষ যুবরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং ঘটনার দিন 'যে-কোনো কাজ করতে পারে' এমন ডজনখানেক গুণ্ডা তার অধীন। সুতরাং মহাদেবের ক্রমপতন ও দিবাকরের উত্থান ভবিষ্যতে আরো একটি জটিল আবর্তের দিকে গ্রাম সমাজকে এগিয়ে দিতে থাকে। বস্তুত, চোরাই জমি

রাখার বিবিধ কৌশল, দারিদ্র্য অশিক্ষা আর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বাড়ির কাজের লোকদের নামে জমি রাখা ও পরে অস্বীকার করা, জমিদখলের জন্য নীতিহীন কার্যকলাপ ও 'রক্তগঙ্গা' বইয়ে দেওয়া কিংবা নারীধর্ষণ — এসবই ছিল সেদিনকার নিয়মিত ছবি। প্রতিকারহীন অন্যায়ের এই ঘটনাগুলো দেখতে দেখতে চেতার মতো লেখকেরও আক্ষেপ আর দীর্ঘশ্বাস "হায় রে মানুষ!"

বস্তুত, ভূমিসংস্কারের জোয়ারে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে একসময় সামন্ততান্ত্রিক বদ্ধতা থেকে মুক্তির সুর শোনা গিয়েছিল, দীর্ঘদিনের আধিপত্যবাদ থেকে নিষ্কৃতির ইশারাও দেখা গিয়েছিল বহুক্ষেত্রে। এক নতুন শ্রেণীচেতনা তৈরি হচ্ছিল, দেখা দিচ্ছিল নতুন স্বপ্ন-আশা-উৎসাহ নিয়ে নতুন মানুষের সম্ভাবনা। এই বিষয়টিকে ধরতে চেয়েছিলেন, পেরেওছিলেন অভিজিৎ। কিন্তু কোথাও যেন ফাঁকি থেকে গিয়েছিল, রাষ্ট্র-প্রশাসন-বিচারব্যবস্থা একযোগে গ্রামের দরিদ্র বুভুক্ষু আধিয়ারদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। সেইসব ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীতের বিষাদিত স্বরলিপি রচনা করেছিলেন অভিজিৎ সেন। তাই বাইরে যখন নরেন ও বীরেন দুই ভাই লোকজন লাঠি-সোঁটা নিয়ে চেতা ও বাওনার আধিজমির দখল নিয়ে নেয় হাল-মই নামিয়ে, গাড়া বিছনের ওপর হাল মই দ্রুত চালিয়ে চার একর জমি নতুন করে গেড়ে দিয়ে, ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে খেতের উপরেই মদ খেয়ে দেখিয়ে দেয় 'গায়ের এবং পয়সার জোর' তাদের কতখানি তখন

> চেতা ও বাওনা ঘরে শুয়ে থাকে মুখ লুকিয়ে, অক্ষমতার লজ্জা ও আফসোস্ নিয়ে। এ এক কঠিন মর্যাদাহানি, যা চাষী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। এ যেন বাপের সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করছে দস্যুরা। অথচ নিষ্ফল আক্রোশে হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছুই করা যাচ্ছে না, আর সেই অসহায় কন্যা অভিশাপ দিচ্ছে বাপ, ভাইকে।[১০]

জে.এল.আর.ও-এর রিপোর্টে চেতা-বাওনার আধিস্বত্ত্বকে স্বীকার করলেও শেষপর্যন্ত হাইকোর্টে মামলা করায় তারা সর্বার্থেই হতাশ আর অসহায় হয়ে পড়ে। পরিণাম— চেতার আত্মহত্যা, অভিজিৎ সেন এখানে সমাজতত্ত্বের নিষ্ঠাবান পর্যবেক্ষক—তাঁর চোখে ধরা পড়েছে সত্তরের পরবর্তী উত্তাল দিনগুলি কিংবা পঁচাত্তরের জরুরি অবস্থার সময়—

> ১. সত্তর দশকের শেষদিকে কিছুই আর আগের মতো ছিল না, এ-সময়ে সমাজ, রাজনীতি এবং তার সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলিতে ভীষণভাবে নাড়াচাড়া পড়ে। ফলে নরেন সরকারি কর্মচারী সংগঠনের প্রগতিশীল অংশ হয়ে একটি বামপন্থী দলের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে, আর বীরেন প্রগতিশীল প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠনে ঢুকে নিজেকে নতুন করে শক্তিশালী করে।[১১]
>
> ২. বাংলা একাশি-বিরাশি সালে মানুষ কিছু বিচিত্র সরকারি আমলাও দেখেছে।

এইসব আমলাদের ধারণা ছিল হাতে সত্যিকারের ক্ষমতা থাকলে মানুষের জন্য কিছু হয়তো করা যায়। তখন নাকি রেলগাড়ি সময়মতো চলছিল, অফিস-কাছারি সময়মত বসছিল।[১২]

কিন্তু ভোট-গ্রাম্য নেতার আস্ফালন—থানাকে হস্তগত করা—জোতদার এবং আধিয়ার দু-পক্ষেরই বামপন্থী সংগঠনে ঢুকে পড়া ইত্যাদি সব ব্যাপার গ্রামের সাধারণ কৃষকের সামাজিক অবস্থানের তেমন কোন পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে আঘাত আসে জোতদারের সঙ্গে পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাসে — মৃত্যু হয় আস্তিক মাল-চেতা কিংবা ধৈর্য মাহাতোর।

'ঈশানী মেঘ' গল্পের ধৈর্য মাহাতো, নীলকণ্ঠের পানের বরোজ প্রাণ দিয়ে আগলে রাখে। ঝড় খেদা, পাথর খেদা, বরোজ বন্ধ, বাণব্রতের যাবতীয় গুপ্ত বিদ্যা ধৈর্য্যর অধিগত, তার কারিগরিতে চৈতন্য দাস-নীলকণ্ঠ দাসের পসার। কিন্তু ধৈর্যর প্রাপ্য মাসান্তে তিরিশটা টাকা আর দেড় মণ ধান। এতে ধৈর্যর চলে, কিন্তু তার বউ-বেটার চলে না। ফলে নিত্য গঞ্জনা শুনতে হয়। ইতিমধ্যে একদিন বরোজে মেয়েমানুষ নিয়ে ঢোকার 'অপরাধে' মালিকের ছেলেকে চড় মারে ধৈর্য, নীলকণ্ঠের স্ত্রীর কাছে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় তারই 'অপরাধ' স্বীকার করতে হয়। নীলকণ্ঠ স্মরণ করিয়ে দেয় 'যি ভিটায় সি বাস করে সিটাও তো নীলকণ্ঠ দাসের।' 'তিনপুরুষ ধরে সেবা' করলেও যে জমির অধিকার বর্তায় না সেটা ক্রমশ বুঝতে পারছে ধৈর্য। কিন্তু এ বোঝাটা তার বিশ্বাসে টান দেয় বলে সে বুঝতে চাইছে না। সেটেলমেন্ট টেবিলের অল্পবয়স্ক প্রধান কানুনগোর কাছে ধরা পড়ে 'নীলকণ্ঠের ভিটায় এক একর পরিমাণ একটা দাগের' রায়তের নাম ধৈর্য মাহাতো। এবার ধৈর্যকে তোয়াজ করে নীলকণ্ঠ, ক'দিন আগে উঠে যেতে বলেছিল, এবার বলে 'সত্যি' না হলেও অফিসারের সামনে তাকে বলতে হবে 'হঁ, ইটা মোর জমি', ধৈর্য অবাক হয়, ভাবতে চায়, কিন্তু নবীন এ- সুযোগ ছাড়তে রাজি হয় না। বাপকে বলে, 'হঁ, তুমু, ক'বা, ই জমি তুমার, আর মুই ক'মো, ছার, ই জমির দখল হামরাদের করাই-দেন, বাস্!' ধৈর্য অসুস্থ, অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সে রাতে বৈশাখে ঈশানী মেঘের গর্জনে শঙ্কিত ধৈর্য বরোজ রক্ষার জন্য বেরিয়ে যায়। ঝড় থামানোর মন্ত্র পড়ে, অভিচার করে কিন্তু বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় তার—

ধৈর্যের উলঙ্গ দেহ .... বরোজের উত্তর-পূর্ব কোণে স্তূপাকৃতি পাটখড়ির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত। দণ্ডায়মান এবং আকাশের দিকে ভয়ংকর শাসনের ভঙ্গিতে আঙুল তোলা।[১৩]

অপঘাত মৃত্যু, বরোজ অশুচি হবে — এই অজুহাতে নীলকণ্ঠ লাশ ওঠাতে বলে নবীনকে। কিন্তু ধৈর্য্যকে দিয়ে যে কাজটা সহজ হতো, এখন সেটা অত সহজ যে হবে না একথা নবীনের কথাতেই ঘোষিত হয় — নীলকণ্ঠকে সে সোজাসুজি বলে —

রপঘাত মিত্যু! বরোজে ছোওয়া লাগতিছে! তা তুমার কি?

.... হঁ, তুমার কি? মোর বাপ, ধৈজ্জ মাহাতো অস্মার নিজের ভিটাৎ যিথায় খুশি মরবে, তাথে তুমার কি? কী, ই ভিটা ধৈজ্জ মাহাতোর লয়?[১৪]

ঈশান কোণে আরো একবার বজ্রগর্ভ মেঘসঞ্চারের ইশারায় গল্প শেষ করেন অভিজিৎ সেন, কিংবা আর-একটি গল্পের সুচনা করেন।

'আইনশৃঙ্খলা' গল্পে জোতজমি এবং উত্তরাধিকার নিয়ে আরেকটি প্রশ্নের সূত্রপাত করেছেন গল্পকার। উত্তরবঙ্গের নাগরতীরবর্তী একটি ছোট গ্রাম বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে চব্বিশটি অগভীর নলকূপের বসানোর উদ্যোগে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যায়। একটি অ্যাগ্রো-সার্ভিস সেন্টার বসিয়ে দ্রুত গ্রামটিকে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও হয়। ওয়ার্ল্ডব্যাঙ্কের প্রবেশে এইখানে ভারতীয় গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্কে বিভিন্ন টানা-পোড়েন শুরু হয়। যে জোতদার এতদিন তার অনুর্বর জমিটিকে চাষির কাছে আধা ফসলের ভাগে ফেলে রেখেছিল, এখন আসন্ন উৎপাদনের কথা ভেবে সে জমিটিকে নিজের হাতে ফিরিয়ে আনতে চায়। এই ধরণের প্রকল্পগুলিতে সরকারি 'কর্মতৎপরতা' যেভাবে থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। অর্থাৎ একাধিক মিটিঙ, টেক্‌নোক্র্যাট-বুরোক্র্যাট ও মন্ত্রীর বাদানুবাদ, কালক্ষেপ ইত্যাদি। কিন্তু এরমধ্যেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাজবংশী পাড়ার টুইলা বর্মণ অসাধ্যসাধন করে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়ে উর্বর জমিতে সার জল দিয়ে বোরোর চারা উঠল লকলকিয়ে। আমেরিকান সাহেব দেশি সাহেবদের সঙ্গে নিয়ে ধানক্ষেতে পৌঁছলেন, টুইলা আর তার বউ কুশলীর ছবি তোলা হল— মডেল কৃষক দম্পতি।

অন্যদিকে ভাগচাষিদের নাম নথিভুক্ত করার সরকারি উদ্যোগ শুরু হয়। আর্থ-সামাজিক সম্পর্কে আবার নতুন মাত্রা যোগ হয়। কেননা জোতদাররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সামান্য কিছু টাকা বা জমির বিনিময়ে ভাগচাষিদের হাত থেকে জমিগুলো নিজেদের দখলে আনতে চায়। সুবিধাবাদী পার্টি কর্মী যোগেন, কিংবা সুশীল মণ্ডল প্রমুখ যে যার নিজের আখের গোছাতে তৎপর হয়। যোগেন একসময়ের রাজনৈতিক কর্মী মহেন্দ্রকে আইন-শৃঙ্খলা ও আরো নানা প্রশ্নে জোতদারদের সঙ্গে ভাগচাষিদের একটা সমঝোতায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে। মহেন্দ্র অসম্মত হলে তার মাছ ভর্তি পুকুরের জলে ফলিডল পড়ে। অন্তিম আঘাতটা আসে টুইলার পরিবারের ওপর। জমি ছাড়তে সে রাজি হয় না বলে তাকে 'ডাকাতে'র হাতে মরতে হয়। তার বউ, তখন চারমাসের গর্ভিণী ধর্ষিত হয়, হারায় তার জিভ আর কণ্ঠস্বর। এখন জোতদারদের আর কোনো সমস্যা থাকে না কেননা 'আইন' তো এমন কথাই বলে যে 'জমি অনাবাদী ফেলে রাখলে আধিয়ার তার স্বত্ত্ব হারায়।' কিন্তু তাদের সে আশা ব্যর্থ হয়। মামলার তারিখে হাকিমের এজলাসে কুশলী পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। আবেগে কেঁপে মহেন্দ্র বলে —

মিরতো আধিয়ার টুইলা বম্মনের ওয়ারিশ আপনার এজলাশোৎ হাজির।[১৫]

অনেক মৃত্যু অনেক প্রতিরোধের পর এই আশাটুকু জাগিয়ে রাখেন অভিজিৎ আইন-শৃঙ্খলার আরো নতুন বিন্যাসের জন্য। দীর্ঘ এই গল্পটিতে প্রশাসনিক দফতর আমলা-মন্ত্রীদের কাজকর্মের চিত্র আছে, বিডিও দিব্যেন্দুর আন্তরিকতার কথা আছে, পাশকুটু-টুইলা-মহেন্দ্র-সুশীল-সতীশদের খুঁটিনাটি আছে— আর এই সবকিছুকে প্রত্যক্ষ করছেন যিনি তাঁর সহানুভূতি যেমন আছে, তেমনই আছে তীব্র শ্লেষ এবং অসাধারণ এক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। এই বোধ থেকেই তিনি বলতে পারেন আখিরা গ্রামের ছ'টি পরিবারের পঁচিশজন সমর্থ পুরুষের মধ্যে দশজন কংগ্রেসি, আটজন বামফ্রন্টের দুটি দলের সঙ্গে যুক্ত, বাকি দু'ঘর 'দোদুল্যমান', সুবিধা বুঝে এদিকে-ওদিক করে। এ-ও জানেন, গ্রামাঞ্চলে যোগেন রায়ের মতো এমন কিছু লোকজন থাকে যাদের সঙ্গে তার 'পার্টির স্ট্র্যাটেজি হলো একদম না ঘাঁটানো।' আর আধিয়ার ঐ গরিব চাষিগুলো আইনশৃঙ্খলা মানে কি বোঝে?

> পেটেৎ ভাত থাকলে আইন, পাছাৎ কাপড় থাকলে ছিংখলা।[১৬]

তবে প্রশাসন যে কখনও কেঁপে ওঠে তার প্রমাণ মেলে হাকিমের এজলাসে প্রসববেদনায় স্বেদসিক্ত কম্পিত কুশলীর ছবিতে —

> কুশলী তার শিশুকে জন্ম দেবে বলে হাকিম সাহেব তার সমস্ত লোকলস্কর নিয়ে তার এজলাস ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রকে বাইরে ঠেলে দিয়ে কুশলী তার নিহত স্বামীর জ্যান্ত রক্তপিণ্ডকে পৃথিবীতে অবতরণের উদ্যোগ নেয়। নবজাতকের চিৎকারে রাষ্ট্রীয় তৎপরতা চালাবার ঘরের দেওয়াল ও কাচ থরথর করে কাঁপে।[১৭]

যে সাতের দশকের মধ্যে দিয়ে লেখকের যাত্রা, সেই সময়ের সব অপমানিত অসহায় বন্দী মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তিনি বোধহয় এইভাবেই ঘোষণা করেন। তবু আরো কত মৃত্যুর সাক্ষী থাকতে হয় অভিজিৎ-কে, গভীর বেদনায় তিনি উচ্চারণ করেন ধানপোকা-নিধনের বৃত্তান্ত। ধানখেতে ফসলের পোকা শস্য খুঁটে খায়, আর অন্ধকারে পোকার মতোই ধান আত্মসাৎ করে সুপিন, সঙ্গে তার মেয়ে তারামণি। রাতের অন্ধকারে গোপনে সাবধানে ধানের ছড়া কেটে রাখে সুপিন, মেয়ে দেয় পাহারা। কিন্তু সে রাতে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সে, খেতের পোকামাকড় আর ইঁদুরেরা নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করতে পারল, পারল না সুপিন। ধরা পড়ে আনীত হল মাহাতোর দাওয়ায়, কেঁদে পড়ল —

> মণ্ডল, তুমি হামার বাপ, তুমি হামার মাও। তোমার তো কত ধান, মণ্ডল। তোমার কত ধান পোকায় খায়, ইঁদুরে খায়, তুমি কতো দান-ধ্যান করেন — তোমার ধান না খালে হামরা আর কার ধান খামো, মণ্ডল?[১৮]

মাহাতো হাসে, পোকায় খায়, ইঁদুরে খায়— সে এক কথা। কিন্তু সুপিন কি ধানপোকা হতে চায়? তাহলে পোকা কি দিয়ে মারা হবে? মাহাতোর ইশারা বুঝে তেনারা

বিষজল ভরা স্প্রেয়ারটা নিয়ে আসে। সুপিনের রক্তাক্ত শরীরের ওপর স্প্রেয়ারের নল বিষাক্ত জলকণা ছড়ায়। মাহাতো হাসে আর বলে — 'দে, দে, পোকার মুখেৎ এস্‌প্রে দে— [১৯]

শুধু কি সুপিনই 'ধানপোকা' হয়ে যায়! তারামণির শরীরের গলিঘুঁজিতে ঘুরে বেড়াতে থাকে যে মাহাতোর হাত অথবা বেড়ালের থাবা—সেই মাহাতো কি পশু নয়!

জমির সঙ্গে অবধারিত জড়িয়ে থাকে যে যৌনতা তা' স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেন অভিজিৎ। তাঁর গল্পে নারীর যৌনতা, বিশেষত নিম্নবর্গের রমণীর যৌনতা (স্মরণীয়, 'ক্ষেত্রপাল' গল্পের শিশোসরী) কখনও কখনও আলাদা মাত্রা পায়। কখনও কখনও নারী আর ভূমি একে অন্যের পরিপূরক হয়ে যায়, তখন গাড়া জমিতে জোর করে হাল নামানো কৃষক-রমণীকে ধর্ষণের সমার্থক হয়ে যায়। কখনও তাঁর চরিত্রেরা বলে, যেমন শালখানকে বলেছিল তার বাবা —

> 'জমি নষ্ট মেয়ামানষের থিকাও ভোয়ানক রে, শালখান। উয়ার পিছনে দৌড়াস না, বাপ।[২০]

অভিজিৎ সেনের গল্পে শুধু জমির সঙ্গে নয়, রাজনীতির সঙ্গেও যৌনতা সম্পৃক্ত, সম্পৃক্ত কয়েকটি 'মানবিক' সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। অভিজিৎ একবার বলেছিলেন,

> যে বয়স পার হয়ে এলে একজন লেখকের যৌনতা নিয়ে লেখার অধিকার জন্মে, সে-বয়স পার করে আমি অমন কয়েকটি গল্প লিখেছি।[২১]

কাক, বদলি জোয়ানের বিবি, স্ফিংস, মালানীপুরের যাত্রী, জেহাঙ্গী, সুবর্ণ জলপাত্র, ফাল্গুনী রাতের পালা, মানবদেহের গৌরব, ইত্যাদি বেশ কয়েকটি গল্পে অভিজিৎ অন্তর্গত যৌনতার এক বিরল প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

বস্তুত, অভিজিৎ সেনের বেশিরভাগ গল্পের প্রেক্ষিত গ্রামবাংলা, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চল। নাগর, চিরি, টাঙন, ব্রাহ্মণী আরো সব নদী নদীখাত বেষ্টিত গ্রাম, বরেন্দ্রভূমির কঠিন মাটি, মারিকার পাথারে বোরো ধানের চাষকেন্দ্রিক তিনমাসের উপনিবেশ এবং বিশেষত ওখানকার লোকের মৌখিক কথ্য ভাষা ব্যবহারে অসাধারণ নৈপুণ্য অভিজিতের গল্পকে নিছকই 'গল্প বলার' ধরণ থেকে আলাদা করেছে। রাজনীতির সূত্রে এবং সমবায় ব্যাঙ্কে কর্মসূত্রে অঞ্চল, অঞ্চলের মানুষকে তাদের খুঁটিনাটি সহ লেখক চেনেন এবং পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন পাঠকের সঙ্গে। বাংলা ছোটোগল্পের বিষয় বিস্তৃত হয়ে গেছে তাঁর কলমে। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি জমির মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে, এক আদিম সারল্যকে বহন করে তারা— সে জন্যই কৌশলী জোতদারের ষড়যন্ত্র বুঝতে না পেরে বিশ্বাস হারানোর আকস্মিক আঘাত তাদের মৃত্যুর কারণ হয়। বস্তুত, বর্গক্ষেত্র, বিষ, ঈশানী মেঘ, আইন-শৃঙ্খলা, মৌরসী পাট্টা, ব্যবচ্ছেদ -এর মতো গল্প পাঠক আগে পড়েনি। দেখেনি 'দেবাংশী'র মতো চরিত্র। অভিজিতের নিজের বক্তব্য

দেবাংশীর মধ্যে যদিও বর্গা বিষয়ক একটি জটিল আখ্যান অংশ আছে, কিন্তু সে গল্পের মূল সুর নিম্নবর্গের মানুষের ধর্মবোধ এবং ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির সীমানা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিয়ে। ধর্মাশ্রয়ী শ্রেণীসংগ্রামের এক বিশেষ রূপ এখানে দেখানো হয়েছে।[২২]

চেনা মধ্যবিত্তের জগৎ থেকে লেখক এ গল্পকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এমন এক জায়গায়, যেখানে সচরাচর কেউ যেতে চায় না। দেবাংশীকে নিয়ে মিথ আমাদের দেশে কিছু কম নেই। বাস্তব আর অধিবাস্তবকে এখানে কীভাবে সমীকৃত করেছেন লেখক সেটাই লক্ষণীয়। অভিজিৎ নিজে 'দেবাংশী'কে উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এ উপন্যাসের লোহার সারবান লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত একাধিক চরিত্রের সমবায়ে গড়া। লোকটি এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মানুষের দেবতা হয়ে ওঠার আখ্যান। লেখক তাকে সহজ বিশ্বাসে গড়ে তুলেছেন, কোথাও অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন তোলেননি, আবার একসময় দেখিয়েছেন নিজের চারপাশে গড়ে ওঠা ভক্তি আর বিশ্বাসের প্রাসাদ-কারাগার থেকে নিজেই মুক্তি চাইছে, সে নিজেই। দৈত্যারির মৃত্যু আর রোহিণী শাসন, এই দুই ঘটনায় নিজের ক্ষমতাকে উপলব্ধি করে নিশ্চুপ হয়ে যায় সারবান লোহার। বলে —

'মঁয় দেবাংশী লয়, মানুষ। ..... মঁয় আর সহায় পারি না। ই দায় থিকা মোক্ উদ্ধার কর, মাও!

দেবাংশীর নির্মোক বর্জনের জন্য ক্রমশ সে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এই গল্পটি প্রসঙ্গে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মন্তব্যটি উদ্ধার করা যাক্—

এই গল্পে ব্যবহৃত স্থানীয় সংস্কার আর শ্লোক আর প্রবাদ যেন হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে দেবাংশীকে নির্মাণ করে তুলেছে। মনে হয় গল্পটি কালনিরপেক্ষ। এই গল্প হাজার বছর আগেরও হতে পারতো। হিউ এন সাঙ যখন এসেছিলেন পুন্ড্রবর্ধন আর সোমপুরের বিহার নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে আশপাশের গ্রামগুলিতে উঁকি দিলে তিনি এই দৃশ্য দেখতে পেতেন। কাহ্নপা লুইপার আমলেও দেবাংশী ছিলো। ..... সমুদ্রের ওপার থেকে সায়েবরা এলো, সায়েবরা গেলো, নতুন সায়েবরা চেপে বসলো, দেবাংশীদের বিনাশ নেই। বাঙলা জুড়ে কতোকালের শয়তানি, জোচ্চুরি আর হারামিপনা চলে আসছে, প্রতিবাদও হচ্ছে আবহমানকাল ধরে। এসবের এই সর্বকালীন চেহারাটি অভিজিৎ নিয়ে এসেছেন অসাধারণ শক্তির সাহায্যে। কাহিনীর শেষে দেখি থিকথিক করছে ক্রুদ্ধ ও প্রতিবাদী মানুষের ভিড়। শয়তান এসে তাড়া-খাওয়া কুত্তার মতো আশ্রয় নিয়েছে খেরা থানের গণ্ডিতে। ঐ জায়গাটা তখন পর্যন্ত ফাঁকা। এখনো ওটা ফাঁকাই রয়েছে। ঐটা দখল করার জন্য অভিজিৎ কোনো উপদেশ দেন না। জায়গাটা কেবল দেখিয়ে দিলেন। এর বেশি ইঙ্গিত কি কোনো শিল্পী দিতে পারেন?[২৩]

দেবাংশী অলৌকিক শক্তির আধার, এমন বিশ্বাস লোকের মনে। এতদিন তার কাছে লোকে ব্যাধিমুক্তির নিদান চেয়েছে, পারিবারিক সমস্যার সমাধান চেয়েছে, স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল চেয়েছে, কিন্তু যখন শুনল 'মালিক, আধি উচ্ছেদ করবা চায়'— সেটা হল নতুন। উপর্যুপরি প্রার্থনায় নিদান দিতে গিয়ে জোতদার দৈত্যারির সঙ্গে বিতণ্ডা, অপমান। দেবাংশী, কি পারে জোতদারের সঙ্গে আধিয়ারের বিরোধের সমাধান করতে! কিন্তু দৈত্যারির ছেলে যখন সেতুর জমির জন্য সেতুর বিবাহিত কন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, সেই বিচার তো চাইছে বারুণী সর্বসমক্ষে খেরার থানে। দেবাংশীর আর শরীর জাগে না। ধর্মের দোহাই দিয়ে কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে এই পাপকে? দেবাংশী তাই সকল সামাজিককে স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের দায়বদ্ধতা, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কথা। ধর্ষক-অপরাধীরা চিহ্নিত হলে আহ্বান জানায় সকলকে —

> তুমরা যারা বাপ আছেন, ভাই আছেন, সোয়ামী আছেন, আপন আপন বেটির, বুনের, ইস্তিরির ইজ্জৎ বাঁচাবার দায় তুমাহোরের, সব্বার। তুমরা যদি সব্বাই চান ই পাপ বন্দ হউক, তবেই ই পাপ বন্দ হবে। ই দায় দেবোংশীর একার লয়।[২৪]

এইখানে ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীতে সঞ্চারিত হয়ে যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা। অভিজিৎ এই আশাটুকু জিইয়ে রাখতে চান। পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখের মধ্যেও এই উপশমের সন্ধান দেন তিনি। এইখানে তাঁর গল্প পাঠকের নিভৃত আলস্যমোচনের বাইরে এক সজাগ সতর্ক চৈতন্যের অধিকারী করে তোলে তাঁকে। পাঁচের ছয়ের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যের সিংহভাগ জুড়ে ছিল নারী-পুরুষের প্রেম ও কামের বর্ণনা। সাত-আটের দশকে এই সম্পর্কের বিন্যাস থেকে নিষ্ক্রমণের প্রয়াস দেখা গেল। বিষয়বৈচিত্র্য, বাস্তবতার ভিন্নমাত্রিক নতুন চেতনায় তখন গড়ে উঠছিল বাংলা গল্প-উপন্যাসের শরীর। কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন, ভূমিব্যবস্থাকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড, ব্রাত্যজনের জীবন, প্রযুক্তির আক্রমণে ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিক্রিয়া, রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও দুর্বৃত্তায়ন এবং আরো অনেক কিছু, এককথায় চলতি দেশকালের অন্তর্গত প্রায় সবকিছুই উঠে আসতে থাকে এইসময়ের লেখায়। নাগরিক বৃত্তের বাইরে আবার গ্রামের দিকে মুখ ফিরেছিল তখন এবং মহাশ্বেতা দেবীর পরে আরো অনেক নবীন গল্পকার এই গ্রামবাংলাকে তুলে আনলেন তাঁদের গল্পে। এই গোষ্ঠীর অগ্রপথিক বলা যেতে পারে অভিজিৎ সেনকে। তাঁরই নিজের ভাষ্য অনুযায়ী

> .... ,ষাট ও সত্তরের প্রায় পুরো সময়টা জুড়ে গ্রামের আর্থ সামাজিক স্তরে নানা ধরনের আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রাম হয়েছে, তাতে নানা ধরনের পরিবর্তন ও নতুন বিন্যাসও হয়েছে।[২৫]

অভিজিৎ সেনের লেখালেখির বিশেষ তাৎপর্য এখানে যে তিনি তাঁর ইতিহাসচেতনা দিয়ে সমকালের এইসব পালাবদলের বিভিন্ন দিককে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

তাঁর সাহিত্য এইভাবে এক বিশেষ সময়ের ভাষ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা ছোটগল্পের গতিপথ বদলে এইখানে অভিজিৎ সেনের অবশ্যমান্য ভূমিকা।

উল্লেখপঞ্জি

১. সাক্ষাৎকার, দ্র. শ্রাবণী পাল সংকলিত 'পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারদের ভাবনা', অক্ষর প্রকাশনী, ২০১১
২. অভিজিৎ সেন, বর্গক্ষেত্র, দেবাংশী, ভূর্জপত্র, ১৯৯০, পৃ. ৩১
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬
৮. ব্যবচ্ছেদ, ঐ, পৃ. ৮২
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯
১০. বিষ, ঐ, পৃ. ১০৮
১১. বিষ, দেবাংশী, ভূর্জপত্র, ১৯৯০, পৃ. ১১১
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
১৩. ঈশানী মেঘ, ঐ, পৃ. ১২৫
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫
১৫. আইন-শৃঙ্খলা, দেবাংশী, ঐ, পৃ. ১৬৫
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০
১৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙা, কোরক, পৃ. ৬৩
১৮. ধানপোকা, ঈশানী মেঘ ও অন্যান্য গল্প, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০৮, পৃ. ৬
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
২০. মৌরসী পাট্টা, দেবাংশী, ১৯৯০, পৃ. ১৩৫
২১. ভূমিকা, অভিজিৎ সেন, অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প, প্রতিক্ষণ, ১৯৯৬
২২. অভিজিৎ সেন, কি লিখি কেন লিখি, কোরক, শারদীয়, পৃ. ৬০
২৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙা, কোরক শারদীয়, পৃ. ৬২-৬৩
২৪. দেবাংশী, দেবাংশী, ১৯৯০, পৃ. ২৬
২৫. অভিজিৎ সেন, কি লিখি কেন লিখি, কোরক, শারদীয়, পৃ. ৫৪

□ অভিজিৎ সেন (১৯৪৫)